বিহঙ্গপ্রবণ

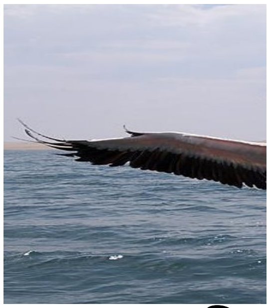

কাজী জহিরুল ইসলাম

এক

হঠাৎ এক পশলা দমকা হাওয়া এলো । হাইকোর্ট সংলগ্ন ফুটপাথ ধরে হাঁটছি । ফুটপাথে বিছিয়ে থাকা ঝরাপাতাগুলো উড়তে শুরু করে । অদ্ভুত এক শব্দ ওঠে, মর্মর ধ্বণি । এই শব্দটি যতোটা না আনন্দের, কোন এক বিচিত্র উপায়ে, আমার কাছে ততোটাই বিষণ্নপ্রবণ । এই শব্দ আমাকে কোথায় যেন নিয়ে যায় । প্রতিবছর ফেব্রুয়ারী মাস এলেই আমার মধ্যে এক ধরনের উদাসীনতা ভর করে । কেউ একজন রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে এলো, নারী । এসেই আমার হাত ধরে, ‘কোথায় যাচ্ছো ?’ আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানি না । আমরা আসলে কোথায় যাই, কোত্থেকে আসি ? কে এই নারী, আমার যাত্রাপথের বৃত্তান্ত জানতে চায় ? ‘চলো আমার সাথে’ । আমি উল্টোদিকে হাঁটি ।

আমি হাঁটতে থাকি । এখন বিকেল । গাছের ছায়ারা লম্বা হতে থাকে । পাখিদের ছায়া পড়ে রমনার নিস্তরঙ্গ লেকে । লেকের কালো জল আরো কালো হয় । একটা বাওকুড়ানী ওঠে । আকাশে ঝরাপাতারা, ছেঁড়া কাগজেরা ঘুরতে থাকে ।

এরপর সন্ধ্যা হয় । আকাশে চাঁদ ওঠে । চাঁদের আলোয় পথ দেখা যায়, বহু দূরের মেঠো পথ । ঝাকরা চুল মাথায়, আগুনের মতো লাল শার্টকে চাঁদের আলোয় কালো দেখাচ্ছে । মানিকনগর ঘাটে যখন নামেন ভদ্রলোক তখন বিকেলের সূর্য মেঘনার বুকে প্রলম্বিত চুমু খায় । তিনি ঢোকেন নিমাইয়ের মিষ্টির দোকানে । একটি হলুদ টিনের পিরিচে দুটো সাদা রসগোল্লা আর বাকরখানি বাড়িয়ে দেয় নিমাই । এলুমুনিয়ামের গ্লাস উপুড় করে পানি খান তিনি, মুখে স্মিত হাসি ।

‘জামাই কোম্বালা আইছেনও’ ।

চমকে তাকায় ভদ্রলোক ।

‘রুশন ভাইসাব না, আছেন কেমুন ?’

‘আছি ভালাঅই, খবর হুনছেন নিচ্ছয় ? পুত অইছে । মাশাল্লাহ, আফনে রাজকফাইল্লা । সোফিয়া বালাঅই আছে । যান, পাও চালায়া যান গা । দিরুং কৈরেন না । ’

‘আপনে যান কই এই অবেলায় ?’

‘যামু নবীনগর । মামলার তারিখ আছে । আমরার আবার বেলা-অবেলা আছে নি ? আফনে পাও চালাইয়ান যান গা জামাই । রাইত করন ঠিক ঐতোনা’ ।

তিনি পা বাড়ান খাগাতুয়া গ্রামের দিকে । প্রথম সন্তানের পিতা হওয়ার আনন্দ তার চোখে-মুখে । সারাপথ মনে মনে ভাবেন, কি নাম রাখবেন ছেলের ? তরুণ ব্যবসায়ী কাজী মঙ্গল মিয়া । সেই শৈশবে তিন ভাই-বোনকে একলা রেখে পিতা-মাতা চলে গেলেন । দাদীর কাছে মানুষ । যখন চোখ তুলে এদিক-সেদিক তাকানো শেখা, তখনি উড়াল । শূন্য খাঁচা বুকে চেপে একলা কাঁদে বৃদ্ধা দাদী । দৌলতপুর গ্রামের বাতাসে সেই কান্না বিলাপের ধ্বণি হয়ে ওড়ে ।

শিশু বয়স থেকেই জীবনের সাথে এক ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধের শুরু । আজো যুদ্ধ চলছে । জীবনকে সুন্দর করার জন্য, জীবনকে উপভোগ্য করার জন্য টাকা দরকার, অনেক টাকা, জীবন-যুদ্ধের প্রতি বাঁকে এই শিক্ষার অমিয় বাণীই ছড়ানো ছিল । ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি । ততোদিনে জেনে যান এ দেশের সবচেয়ে ধনী মানুষের নাম, জহুরুল ইসলাম । মাত্র ২৬ বছর বয়সে ব্যবসা করতে এসে এখন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ঠিকাদার । দেশের সবচেয়ে বড় ধনী । চোখে-মুখে আনন্দের দ্যুতি, স্বপ্নের ফেনা, চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত । পেয়ে গেছি, ছেলের নাম জহুরুল ইসলাম । আমার ছেলেও একদিন তার মতো বড় ব্যবসায়ী হবে, সেরা ব্যবসায়ী, অনেক ধনী । আমার জীবনে যদি স্বপ্ন পূরণ না-ও হয়, ছেলের জীবনে হবে ।

শ্যামগ্রাম পেরিয়ে তিনি পা রাখেন দীর্ঘশাইর-এর চকে । চাঁদের আলোয় অনেক দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে খাগাতুয়া গ্রামের দরোজা, এক সুবিশাল বটবৃক্ষ । এই বটগাছটিই খাগাতুয়া গ্রামের সীমান্তবৃক্ষ, এক অনড় প্রহরী । আজ আনন্দের রাতে ও যেন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে ওর ঝাকড়া চুল দুলিয়ে খলবল করে হাসছে । কলুই-মটর তোলা হয়ে গেছে অনেক আগেই । কোন অলস চাষী হয়ত এতোদিন পরে মটরক্ষেতের নাড়া পোড়াচ্ছে । দূর থেকে আগুনের জিভ দেখা যাচ্ছে, বাতাসে নাড়া পোড়ার গন্ধ ভেসে আসছে । শীত চলে গেছে । শেষ ফাল্গুন । তবুও হালকা কুয়াশা পড়ছে । অদ্ভুত প্রকৃতি । সকালে বৃষ্টি হলো । এখন ফকফকা আকাশ । বৃষ্টি ধোয়া শিশির ভেজা পূর্ণিমা চাঁদটাকে স্বাভাবিকের চেয়ে খানিকটা বড় লাগছে আজ । যেন ও খাগাতুয়া গ্রামের বাঁশঝাড়গুলোর মাথার ওপর নেমে এসেছে । শিশির ভেজা নরোম চাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবেন, এ ছেলে নিশ্চয়ই একদিন অনেক বড় হবে । পিতার কল্পণায় স্বপ্নের প্রলম্বিত ছায়া ।

‘জামাই আইছেগো, জামাই আইছে ।’
উৎসবের বাড়িতে জ্যোৎস্নারাতে চাতালে খেলছিল যেসব কিশোরীরা, সমবেত হর্ষধ্বণি তোলে । কেউ কেউ, যারা কিছুটা বড়, আনাড়ি হাতে পরা শাড়ির আঁচল গুটিয়ে চাতালের খানাখন্দগুলো লম্বা-লম্বা একেকটা লাফে পেরিয়ে সোজা অন্দরবাড়ির দিকে ছুটতে থাকে । অন্দরমহলে ব্যস্ততা বেড়ে যায় । রুস্তম কাজীর পেছন পেছন তার দুই কিশোর পুত্র হুশেন ও শহীদ এগিয়ে এসে দুলাভাইয়ের হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে নেয় ।

এই হলো আমার জন্মদিনের বৃত্তান্ত। ১৯৬৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী । ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর থানার একটি বিখ্যাত গ্রাম, খাগাতুয়া । প্রথম সন্তান বঙ্গীয় স্ত্রীলোকেরা পিতৃালয়ে প্রসব করে থাকে । এটাই প্রথা । সেই প্রথাগত কারণেই আমারও জন্ম হয় মাতুলালয়ে ।

বড় খালা আব্বা আসার খবর পেয়ে প্রসূতির ঘর থেকে উঠে আসেন ।

‘বাদলের বাপ আসছেন ?’

আব্বা অবাক হন খালার মুখে নবজাতকের নাম শুনে ।
‘এমন বাদল দিনে যে শিশুর জন্ম তার নাম বাদল রাখবো নাতো কি রাখবো ?’
আব্বা বলেন,
‘আপা, আমি যে অন্য একটা নাম ঠিক করে রেখেছিলাম ।’
‘কি নাম ?’
‘জহুরুল ইসলাম ।’
‘বেশতো । ওর ভালো নাম হবে কাজী জহিরুল ইসলাম । শুধু খাতাপত্রে । আর আমরা ডাকবো বাদল বলে ।’
হঠাৎ পেছনে তাকিয়েই বলেন,
‘এই হুশেন, তর দুলাভাইরে অজুর পানি দে । গরম পানি দিবি ।’
তারপর আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে বড়খালা বলেন,
‘ঠিক আফনের মতোন হৈছে । রাজপুত্তুর । যান অজু কৈরা আসেন । ছেলের মুখ দেখবেন ।’

ষাটের দশকের শেষদিকটায় রাজনৈতিক অস্থিরতা কিছুটা দানা বাঁধে । এই সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানে ওলাওঠা রোগের প্রদূর্ভাবও দেখা দেয় । গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছিলো । মূলত এটা শুরু হয় কার্তিক-অগ্রহায়ন মাসে । আমার নানা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন আমার জন্য, আম্মার জন্য । তার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আম্মা ছিলেন দ্বিতীয় কন্যা, প্রথম কন্যা রফিয়া বেগমের এখনো সন্তান হয় নি । তিন মামার সবাই কিশোর । কাজেই আমিই নতুন প্রজন্মের প্রথম প্রদীপ । আমাকে নিয়ে উল্লাস ও দুশ্চিন্তা দুই-ই বেশি ।

ষাটের দশকের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর মধ্যে উপমহাদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ, আর বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিনীদের ভিয়েতনাম যুদ্ধ । এই দুটি যুদ্ধেই প্রচুর লোক মারা যায় । সভ্যতার উজ্জ্বল ইতিহাসে দুটি কালির আচড় । এ ছাড়া আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পুরো ষাটের দশক জুড়ে বিশ্ব রাজনীতিতে ঘটেছে । ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মার্কিনীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ওপরই মিডিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সবচেয়ে বেশি । ১৯৬০ সালের মে মাসে মার্কিন বিমানবাহিনীর ফ্রান্সিস গ্যারি পাওয়ার ইউ-২ স্পাই প্লেন নিয়ে ওড়ার সময় রাশিয়াতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ভূ-পাতিত হয় । এই ঘটনা প্যারিস সম্মেলনকে ধুলিস্মাৎ করে দেয় ।

হিটলারের অন্যতম সহযোগী, অগণিত উহুদী হন্তারক নাজিবাহিনীর শীর্ষনেতাদের একজন এডলফ আইখম্যান মোশাদ এবং শাবাক এর নেতৃত্বাধীন একটি দলের হাতে ধরা পড়েন ১৯৬০ সালের ১১ মে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আয়ারসের এক শহরতলীতে । আইখম্যান তখন বুয়েনস আয়ারসের মার্সিডিস বেঞ্জ কারখানায় একজন ফোরম্যানের কাজ করতেন । মোশাদ ও শাবাকের লোকেরা সারাদিন তার বাড়িতে ওৎ পেতে ছিল । আইখম্যানকে ধরা হয় বেশ নাটকীয়ভাবে ।

কাজ শেষে বাড়ি ফিরে তিনি বাস থেকে নামছেন কি-না সেটা নিশ্চিত করার জন্য একজন এজেন্ট সরাক্ষণ দৃষ্টি রাখছেন বাসগুলোর দিকে । দু’জন এজেন্ট ওর বাড়ির সামনের একটি ভাঙা গাড়িতে বসে খুটখাট করছিলেন । যেন তারা গাড়ি মেরামত করছেন । আইখম্যান বাস থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে নিজের বাড়ির কাছে এলে ভাঙা গাড়ির একজন, যার নাম জভি আহারোনি, ওর কাছে সিগারেট চান । আইখম্যান তাকে সিগারেট দেবার জন্য পকেটে হাত দিলে অন্যজন, পিটার মালভিন (পোলিশ ইহুদি, কারাতে ব্ল্যাকবেল্ট) তাকে আচমকা আক্রমণ করেন এবং দু’জন মিলে তাকে গাড়িতে নিয়ে বসান ।

ঘাড়ের ওপর আঘাত করায় আইখম্যান সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন । এরপর তাকে মোশাদের একটি গোপন ও নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় । ওখানে আইখম্যানকে রাখা হয় ১০ দিন । এর মধ্যে ওরা সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে কিভাবে আর্জেন্টিনীয় সরকারের চোখকে ফাকি দিয়ে আইখম্যানকে নিয়ে যাওয়া হবে ইসরাইলে । ২১ মে এল আল ব্রিস্টল ব্রিটানিয়া নামের একটি বাণিজ্যিক বিমানে করে বুয়েনস আয়ারস থেকে আইখম্যানকে জীবন্ত অবস্থায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ইসরাইলে ।

যদি কোন কারণে ব্রিস্টল ব্রিটানিয়া তাকে বহন করতে না চাইতো বা গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যেত তাহলে ব্যাক-আপ সাপোর্ট হিসাবে আরো একটি প্লেন তৈরী রাখা হয়েছিল । আর যদি আর্জেন্টিনার পুলিশ জেনে যেত, তাহলে একজন এজেন্ট নিজেকে আইখম্যান পরিচয় দিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দিত এবং মূল আইখম্যান চলে যেত ইসরাইলে, এভাবেই পরিকল্পণা করা হয়েছিল । পরবর্তিতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ন আইখম্যানকে ধরার ব্যাপারে ইসরাইলের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আর্তুরো ফ্রোন্দিজির কাছে । তিনি বলেন একদল কট্টরপন্থী ইহুদী স্বেচ্ছাসেবক আইখম্যানকে ধরে এবং ইসরাইলে নিয়ে আসে । এটা যে একটা ডাঁহা মিথ্যা কথা তার প্রমাণ মেলে যখন দু'দিনের মধ্যেই (২৩ মে, ১৯৬০) প্রধানমন্ত্রী গুরিয়ন ইসরাইলী সংসদ ক্লেসেট-এ আইখম্যান-এর বন্দীত্বের কথা ঘোষণা করেন ।

১৯৬১ সালের ১১ এপ্রিল জেরুজালেমের আদালতে কার্ল এডলফ আইখম্যানকে বিচারের জন্য হাজির করা হয় । তাকে কাঠগড়ার দাঁড় করানো হয় বুলেটপ্রুফ কাচের বাক্সের ভেতর । তিনি তখন একটি কালো কোট পরা ছিলেন । ইসরাইলের এটর্নি জেনারেল গিডেওন হুসনার এই বিচারকার্যে প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন । তার বিরুদ্ধে আনীত ১৫টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের উত্তরে আইখম্যান শুধু একটি কথাই বলেছিলেন, 'আমি হুকুম পালন করেছিমাত্র'। ১৪ আগস্ট (পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস, তখন আমাদেরও) আইখম্যানের বিচারকার্য শেষ হয় । তিন বিচারক একমত হয়ে ১৫ ডিসেম্বর তার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেন । আইখম্যান রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেন । আপীলে তিনি বলেন, সেনাধর্ম অনুসারে তিনি উর্ধতনের হুকুম পালন করেছেন মাত্র । তিনি নির্দোষ । ২৯ মে ১৯৬২ সালে ইসরাইলের সুপ্রীম কোর্ট আইখম্যানের আপীল নাকচ করে দেন । সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হলো রাষ্ট্রপতি । আইখম্যানের হয়ে অসংখ্য মানুষ রাস্ট্রপতি ইতজহাক বেন-জভি'র কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন । প্রেসিডেন্ট বেন-জভি স্যামুয়েলের বই থেকে উদ্ধৃত করেন, 'যেতেতু তোমার তরবারী নারীদের কাঁদিয়েছে, সুতরাং তোমার মা-ও কাঁদবে তাদেরই একজন হয়ে' ।

১৯৬২ সালের ১ জুন রামলা কারাগারে আইখম্যানকে ফাসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয় ।

আইখম্যানের মতো নাজি বাহিনীর আরো অনেকেই বিভিন্ন স্থানে ধরা পড়েছে । কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তারা সকলেই একই কথা বলেছে, আমি হুকুম পালন করেছি মাত্র । মিলিটারী ব্যাবস্থাপনায় এটাই হওয়া উচিত । তা না হলে চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়বে । তারপরেও বলবো ইতিহাসের এই অংশ থেকে বোধ হয় আমাদের কিছু শেখা উচিত । মানবতা, মানব ধর্ম সকল হুকুমের উর্ধে, একথা না মানলে একদিন তার খেসারত দিতেই হয় ।

১৯৬০ সালে আফ্রিকায় এক বিরাট পরিবর্তন আসে । সেনেগাল, ঘানা, নাইজেরিয়া, মাদাগাস্কার এবং জায়ার স্বাধীনতা লাভ করে । চায়না ধীরে ধীরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে । গড়ে তুলতে শুরু করে নিজস্ব ধারার কম্যুনিজম । ঠান্ডা লড়াই শুরু হয় চায়না-

সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে । অন্য কমিউনিস্ট ব্লকের দেশগুলো নড়ে-চড়ে বসে । দ্বিধাবিভক্তির সুক্ষ্ম এক রেখা উঁকি মারে পুরো সমাজতান্ত্রিক ব্লকেই ।

১৯৬১ সালে জন এফ কেনেডি আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহন করেন ২০ জানুয়ারী । এর আগে ৩ জানুয়ারী মার্কিন যুক্তরাস্ট্র কিউবার সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে । এই সময়ে আকাশের নিয়ন্ত্রণ নিতে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে শুরু হয় এক নতুন প্রতিযোগীতা । সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঠায় ইউরি গ্যাগারিনকে আর আমেরিকা দুই দফায় মহাশূন্যে পাঠায় এলান বি শেফার্ড আর ভার্গিল গ্রিশমকে । সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘেরমান স্টেপানোভিচ টিটভ সোভিয়েত স্পেসশিপ ভস্টক-২ নিয়ে ২৫ ঘন্টায় সাড়ে সতেরবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসেন । তিনি অতিক্রম করেন ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৬০ মাইল পথ । কে কার আগে আকাশের কতোখানি জয় করবে এ নেশায় মত্ত বিজ্ঞানীরা । রাস্ট্রনায়করা, যে আগে আকাশের যতো উপরে উঠবে সে ততো বড়, এই রকম মানসিকতার পরিচয় দিতে শুরু করেন । আসলে পুরো ব্যাপারটাই হলো পেশীশক্তি দেখানো । আকাশ জয় করা মানেই হলো, অর্থ এবং বুদ্ধিতে আমি বড়, প্রযুক্তিতে আমি বড় । অতএব সাবধান ।